নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ৬৬-৭২
© ১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পরিচিতি নির্মাণের রাজনীতি

মির্জা তাসলিমা সুলতানা*

ক.

জাতি ও জাতিসত্তার পরিচয় আলোচনায় প্রায়শই 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'-এর প্রশ্নটি আসে। নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বলতে সত্যিকার কী বোঝানো হয়, ব্যাপারটি খুবই অস্পষ্ট। তবে ধরে নেওয়া যায় নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে যে গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশন করে তাই ঐ সকল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অর্থাৎ গবেষিত জনগোষ্ঠীর নরবর্ণগত পরিচয়, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ধর্ম, আত্মীয়তা সম্পর্ক, নেতৃত্ব বাবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা তথা সমগ্র জীবন ব্যবস্থা নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনায় উপস্থাপিত হয়। প্রশ্ন থাকে জনগোষ্ঠীর এই যে পরিচয় তা'কি সকল সময়ের জন্য সত্য? নৃবিজ্ঞানী ভেদে কি এই পরিচয় পরিবেশন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে? যে পরিচয় কোন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা এ ব্যবস্থায় পাই- তা কি আসলেই ঐ জনগোষ্ঠীর খাঁটি পরিচয়? কোন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানীদের জন্য এরকম জনগোষ্ঠী পাঠ জরুরী ছিল ? সমসাময়িক সময়ে নৃবিজ্ঞানেই এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হচ্ছে । এই আলোচনায় আমি মূলতঃ সেদিকেই দৃষ্টিপাত করব। দুটো কারণে এই আলোচনা জরুরী বলে আমার মনে হয়েছে - প্রথমতঃ বাংলা ভাষায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলো নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ইদানীং পরিচয় বা identity নিয়ে ভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়ে থাকে 'পরিচয়' বা identity- র মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলের একটা নির্দিষ্ট ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়। সেকারণে আমাদের উচিত (অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানীদের) নির্দিষ্ট 'পরিচয়' না দেখে বরং কোন প্রক্রিয়ায় এই পরিচয় নির্মিত হয়, তা দেখা (Seymour-Smith 1987:145)।

খ.

ঔপনিবেশিক যুগে পরিব্রাজক, মিশনারী ও গবেষকরা ইউরোপের বাইরে উপনিবেশিতদের 'আদিম' 'বর্বর' 'সরল' ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। যেমন নরবর্ণের ভিত্তিতে এই বিশেষণ দেওয়া হয়েছে - একইসাথে সমাজ সংস্কৃতির বিবেচনাও এই বিশেষণের সাথে যুক্ত।

আঠার-উনিশ শতকে বৃটেনে সামাজিক নৃবিজ্ঞানে নরবর্ণ নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলছিল, সেই প্রেক্ষিতে বলা যায় নরবর্ণ শুধু যে জৈবিক তা নয়, এই ধারণার বেশীরভাগ অংশই মতাদর্শিক ছিল। নরবর্ণ আলোচনায় মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরাই শ্রেষ্ঠতর এটা প্রমান করা । মস্তিষ্কের আকৃতি যাদের বড়

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

তারাই শ্রেষ্ঠ এই ধারনা থেকে গবেষণারত অবস্থায় যখন দেখা গেল জাপানীদের বা আফ্রিকানদের মস্তিষ্কের আকার ইউরোপীয়দের চাইতে বড় তখন হঠাৎ করেই মস্তিষ্কের আকৃতি নিয়ে গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় (Bolt 1977)। এই উদাহরণ নরবর্ণ ধারণার মতাদর্শিক দিকটি প্রমাণ করে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পশ্চিমা আধ্যিপত্যবাদীদের চেয়ে ভিন্নদের 'আদিম' 'বর্বর' বলা হয়েছে। কারণ ক্ষমতাবান উপনিবেশবাদীরা নিজেদেরকে মানব বিবর্তনের একরৈখিক ধারাবাহিকতায় সর্বোচ্চ অবস্থানে অর্থাৎ সভ্য জাতি বলে দাবী করেছেন। এমনকি উদারনৈতিক তাত্ত্বিকরা এমনটিও মনে করেন যে এই 'অসভ্য' 'বর্বর' জাতিকে শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য করার দায়িত্বও ইউরোপীয় সভ্য জাতিগুলোর (Beattie 1964)। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ভূখন্ডগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও উপনিবেশিতদের প্রতিরোধ শুরু হলে এবং নরবর্ণবাদীরা প্রচন্ড বিরোধিতার মুখোমুখি হলে এ সকল জাতির পরিচয়ের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনার ফলাফল হিসাবে এদেরকে 'বর্বর' না বলে 'অন্য সংস্কৃতি' প্রত্যয়ের মাধ্যমে সহনশীল করার প্রবণতা দেখা যায়। জন বিটি অবশ্য এই অন্য সংস্কৃতিগুলোকে সহজ সরল সমাজই বলছেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমা জটিল সমাজের চাইতে এই সমাজগুলো সরল বলে নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে এই সমাজগুলো পাঠ সহজ। যদিও তিনি মনে করেন সরল ভেবে গবেষক যেন তার নিজের কাজকে সহজসাধ্য না মনে করেন। এছাড়া তিনি আরো মনে করেন যে আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলোতে লিখিত নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা নেই বলে ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীদেরই উচিত এই সংস্কৃতিগুলোর তথ্য নথিভুক্ত করা । অতি দ্রুত এই সংস্কৃতিগুলো সংগ্রহ করে রাখার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কারণ বাইরের বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদের সংস্কৃতির খাঁটি রূপটি আর থাকছে না বরং সংস্কৃতিগুলো অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়ছে (Beattie 1964)।

নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডে দুভাবে সংস্কৃতির পরিচয়কে সংগ্রহ করা হয়েছে। তার একটি নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা দলিল হিসাবে বিবেচিত এথনোগ্রাফী এবং অপরটি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশগুলোতে গড়ে ওঠা এথনোগ্রাফিক মিউজিয়াম। পরবর্তী অংশে এথনোগ্রাফী ও মিউজিয়ামে পরিবেশিত সংস্কৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হচ্ছে, তা আলোচনা করব।

গ.

কিন্তু তার আগে 'অন্য সংস্কৃতি'-কে কেন আদিম সমাজ ধারণারই রূপান্তর বলছি সেটা খানিকটা স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেকের মনে হতে পারে 'অন্য সংস্কৃতি' প্রত্যয়টি যথেষ্ট গ্রহনযোগ্য; কোনভাবেই এটি 'বর্বর', 'আদিম' এই বিশেষনগুলোর সাথে তুলনীয় নয়। বরং অন্যতার শব্দগত অর্থ থেকে দেখলে নিজের সাপেক্ষে আর সকলেই তো অন্য। একই কারণে নিজের সংস্কৃতির বিচারে বিদ্যমান সকল সংস্কৃতিই তো 'অন্য সংস্কৃতি' বাঙালী-বিহারী, বৃটিশ-ভারতীয়,

বাঙালী-পাহাড়ী এরা সকলেই তো সকলের বিচারে 'অন্য', তবে কেন এই এঁড়ে তর্ক? জ্ঞানকান্ডের প্রয়োজনে অন্যকে জানা এবং জানানো যদি অত্যন্ত জরুরী হয় তাহলেও আমাদের দেখতে হবে সকল সংস্কৃতির লোকজন কি একইভাবে এই জানা ও জানানোতে অংশ নিতে পারে? লক্ষ্য করে দেখুন, ইতিহাসে বৃটিশ সমাজের কাছে যেভাবে ভারতীয় সমাজ বা আফ্রিকার বিভিন্ন সমাজ 'অন্য সংস্কৃতি' হিসাবে পরিচিত হয়েছে একইভাবে কি ভারতীয় সমাজ বা আফ্রিকার সমাজগুলো বৃটিশ সমাজকে 'অন্য' বলতে বা পাঠ করতে পারে? বরং বৃটিশ হেজেমনি ভারতীয় বা আফ্রিকান সমাজের পরতে পরতে বিস্তৃত হয়েছে। ইউরোপের 'প্রগতির' (progress) আলোকে অ-ইউরোপীয়রা হয়েছে ট্রাডিশনাল। আর ইউরোপকে মানডন্ড ধরে এই সমাজগুলোকে আধুনিক (modern) করার চেষ্টা চলেছে (Asad 1991)। ফলে বৃটিশদের জীবনযাপনই আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত। ভারতীয় বা আফ্রিকানরা শুদ্ধ বৃটিশ হতে যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে যায়।

অনেকে হয়তো বলবেন, চাইলেই আমরা যারা পঠিত হই 'পাশ্চাত্য'[১] দ্বারা তারা পাশ্চাত্যের কোন জনগোষ্ঠীকে পাঠ করতে পারি। এই বলার মধ্য দিয়ে যা মনে হতে পারে তা হচ্ছে দেখাদেখির ক্ষেত্রে ক্ষমতার কোন ভূমিকা নেই কিংবা ভূমিকা থাকলেও ক্ষমতা সর্বত্র সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। উদাহরণ দিয়ে অন্যভাবে বলা যায়। যেমন কারও কারও মতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পাহাড়ীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঙালীরা যেমন পাহাড়ীদের অবিশ্বাস করে তেমনি পাহাড়ীরা (ত্রিপুরারা) বাঙালীদের বিজাতীয় ('উআনজাই-সিকাম') বলে এবং অপছন্দ করে (দেখুন, Tripura and Ahmed 1994)। বাঙালী-পাহাড়ী সম্পর্কে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং জাতিগত সীমারেখা টেকানোর ডিসকোর্সগুলো যদি এভাবে তুলনীয় হিসাবে হাজির করা হয় এবং ক্ষমতার অপরাপর উৎসগুলো যদি আমরা না দেখি, তবে কি আমরাও প্রবল ক্ষমতার পক্ষপাতিত্ব করি না? কারণ পাহাড়ী-বাঙালী সম্পর্কে কি বাঙালীরাই সুবিধাজনক অবস্থায় নেই? বাঙালীদের তুলে ধরা 'উপজাতীয়' (পূর্বোক্ত) বৈশিষ্ট্যই কি এই পাহাড়ীদের পরিচয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না? পাহাড়ীদের পাল্টা অবিশ্বাসের (কিংবা প্রতিরোধের!) ডিসকোর্স আমরা কতটুকু জানতে পারি? বরঞ্চ ব্রিটিশদের তৈরি করা ক্যাটাগরি 'উপজাতীয়' ধারণাটিই আজও প্রবল মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

তাই বলব 'অন্য'-র কথা বলে আসলে ক্ষমতার পার্থক্যকে আড়াল করা হয়; পরিচয় যে 'নির্মিত' তা না বলে বরং তাকেও স্বাভাবিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 'অন্য সংস্কৃতি' প্রত্যয়টিকে তাই যতই নির্দোষ মনে হোক না কেন এর সাথে 'আদিম' 'বর্বর' এই বিশেষণগুলোর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

ঘ.

'এথনোগ্রাফি' সংস্কৃতির পরিচয় জানার বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। কারণ নৃবিজ্ঞানীরাই সরেজমিনে কোন সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহ করে। জনগোষ্ঠীতে স্বশরীরে

অবস্থানের মাধ্যমে অজানা ও অচেনাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের পরিচয় জানার বিরল গুণ কেবল নৃবিজ্ঞানীরই থাকে?! মাঠগবেষণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণমূলক এই অনন্য পদ্ধতি ব্রনিস্‌লো ম্যালিনস্কির ট্রব্রিয়ান্ডবাসীদের উপর এথনোগ্রাফী পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ম্যালিনস্কি ১৯৬০-এর দশকে তাঁর মর্যাদা হারান, কারণ এসময় তাঁর গবেষণা ডায়রী প্রকাশিত হলে দেখা যায় তিনি এই ট্রব্রিয়ান্ডবাসীদের কতই না অসম্মানের চোখে দেখতেন। তা ছাড়া এই মাঠকর্ম ছিল তাঁর কাছে 'নিগার' পরিবেষ্টিত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন (Stocking 1983)। উনিশ শতকে রোমান্টিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশ পাঠকের জন্য লিখিত এই ধরনের এথনোগ্রাফীগুলোতে প্রায়শই কোন জনগোষ্ঠীর এমন পরিচয় থাকত যেখানে এদের যৌন জীবনের বর্ণনা ও ছাপানো ছবি পর্ণোগ্রাফীর সাথে তুলনীয়। যা ভদ্র বৃটিশদের জীবনযাপনে নিষিদ্ধ হলেও জনপ্রিয় ছিল (Kuklic 1991:13)। জ্ঞানচর্চার নিরপেক্ষতার নামে তৈরি এই ধরনের পরিচয়ের বর্ণনায় বাদ থাকত কিভাবে ম্যালিনস্কি একজন পোলিশ হওয়ায়, তৎকালীন আরেক প্রভাবশালী নৃবিজ্ঞানী জেমস্ ফ্রেজারের নিকটজনের (ব্রিটিশ উপনিবেশ ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপের গভর্ণর) সহায়তায় গবেষণা করতে পেরেছিলেন, সেই ইতিবৃত্ত (ibid:16)। আরও জানা যায় না, শ্বেতাঙ্গ ম্যালিনস্কির সাথে অথবা যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তিনি, তার সাথে ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের কী সম্পর্ক কিংবা উপনিবেশিত হওয়ায় কোন ধরনের টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে এদের জীবনযাপন করতে হ'ত।

এছাড়া ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে নৃবিজ্ঞানীরা সহযোগী হিসাবে কাম্য ছিলেন। এটা বোঝা যায় লর্ড হেইলের (যিনি ইন্ডিয়ান সিভিল কাউন্সিলের একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন) একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছিলেন, "যদি নৃবিজ্ঞানীরা উপনিবেশিত অঞ্চলগুলোতে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না দেয় তবে আমাদের অন্য নামের কোন দলকে খুঁজে বের করতে হবে, যারা এই কাজগুলো করবে," (Kuklic 1991:14) অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানীরা সবসময়ই এধরনের সহযোগিতা তাঁদের ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের দিয়ে এসেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষণের পাশাপাশি এরা নিশ্চয়ই সুচারুভাবে বহু বিষয় আড়াল করার কাজটিও করেছেন। সংস্কৃতির পরিচয় বিপননকারী এই নৃবিজ্ঞানীরা আবার একইসাথে বৃটিশ বা আমেরিকার জনগনের কাম্য জীবনযাপনই এথনোগ্রাফীতে এনেছেন, যেগুলো আবার তাদের (এসকল নৃবিজ্ঞানীদের) জনপ্রিয়তা দিয়েছে (Kuklic 1991:13)।

ঙ.

এথনোগ্রাফী ছাড়া আরও যে উপায়ে সংস্কৃতির পরিচয় নির্মাণ করা জনপ্রিয়, তা হচ্ছে, জাদুঘর। ১৮৪০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত সময়কালকে 'Museum Period' বলা হয় (Stocking 1985:7)। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকাতে বিভিন্ন জাদুঘর স্থাপন করা হয় এবং 'আদিম' বা 'অন্য' বলতে যাদের বোঝায় তাদের

ব্যবহৃত পোষাক, হাতিয়ার, তৈজসপত্র এবং বাড়িঘর সংগ্রহ করে কিংবা পূণর্নির্মাণ করে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও থাকে কোন জনগোষ্ঠীর ফটোগ্রাফ। চেষ্টা করা হয় এদের এই সকল বস্তুগত পরিচয়কে যেন স্বরূপেই পরিবেশন করা যায়। বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা দ্রব্যসামগ্রীর মালিকানা নিয়ে। এধরনের প্রদর্শনের কি অধিকার রয়েছে অধিকতর ক্ষমতাশালীদের? এটা শুধু মালিকানার প্রশ্নই নয় এর মধ্য দিয়ে আরো যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে-কে এই পরিবেশনের নিয়ন্ত্রক? চাইলেই কি ভারতবাসী কিংবা ট্রব্রিয়াণ্ডবাসীদের পক্ষে বৃটিশদের নিয়ে যাদুঘর তৈরী করা সম্ভব? এথ্নোগ্রাফী মিউজিয়ামের মধ্য দিয়ে কি আসলে অ-ইউরোপীয়দেরকে বিশ্ব ইতিহাস থেকে পৃথক করে 'নান্দনিক' (পশ্চিমা বোধে) করে উপস্থাপন করা হচ্ছে না ? আর কোনো জনগোষ্ঠীর পরিচয় কি তবে ঐ চৌকোনা বিশেষ কাঁচের ফ্রেমে বন্দি হয়ে যাচ্ছে না? এজন্য জাদুঘরকে 'স্থির প্রতিষ্ঠান'- ও বলা হয় (পূর্বোক্ত: ১১)।[২] ইদানীং এই সকল প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য রেখে জাদুঘরে কোন সংস্কৃতির পরিবর্তনকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এটা করা হচ্ছে আদি হাতিয়ার ও পোষাকের পাশাপাশি আধুনিক (পশ্চিমা) যন্ত্রপাতি বা কোন বাণিজ্যিক দোকান বা অন্য কোন কিছু প্রদর্শনের মাধ্যমে। এখানে জাদুঘর ও তার কিউরেটরই হয়ে উঠছে খাঁটি সংস্কৃতির পরিচয়দানকারী, অর্থ্যাৎ অন্য সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার কর্তৃত্বও তার (দেখুন, Lidehi 1997)। বর্তমানে জাদুঘরকে কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের জন্য এমনভাবে অপরিহার্য করে তোলা হয়েছে যে আপাত অর্থে জাদুঘরকে নির্দোষ এবং প্রয়োজনীয় মনে হয়।

চ.

এথ্নোগ্রাফী এবং জাদুঘরে সংস্কৃতির পরিচয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া হয় এবং ঐ বিষয়গুলোই কোন সংস্কৃতিকে চেনার মূল উপায় হয়ে ওঠে। যেমন ট্রব্রিয়াণ্ডবাসী অর্থ কুলা রিং, ভারতীয় সমাজ অর্থ জজমানী ব্যবস্থা বা চতুর্বর্ণ ভিত্তিক ব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ মানেই পর্দাপ্রথা, এই ধরনের কিছু 'অনিবার্য' (essential) অর্থ তৈরি হয় (Asad 1979)। এমনকি বলা যায় বর্তমান সময়েও গবেষক এই ধরনের পরিচয়ের ভিত্তিতেই কোন সমাজের খাঁটি সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে থাকেন।

খাঁটি সংস্কৃতির পরিচয় নির্মাণকারী এই নৃবিজ্ঞানীগণ নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে অন্য জাতিগোষ্ঠীর যে পরিচয় পরিবেশন করেন তার বিরুদ্ধে তাই উপনিবেশবাদী ও হালে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য পাকাপোক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। অনেকে আবার নৃবিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত উপনিবেশবাদ বিরোধী অবস্থানের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেছেন নৃবিজ্ঞান কেবলমাত্র উপনিবেশবাদের স্বার্থে কাজ করে না, এর ব্যতিক্রমও আছে। এক্ষেত্রে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হচ্ছে, নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের মতাদর্শিক ভূমিকা নিজেই উপনিবেশ তথা ক্ষমতাবানের পক্ষে ছিল বলে,

ক্ষমতাহীনের পরিচয় ক্ষমতাবানের মনমতই হবে। এখানে নৃবিজ্ঞানীর নিজের ভূমিকা সরাসরি উপনিবেশবাদের বিরোধী হলেও তেমন কিছু যায় আসে না।

সংস্কৃতির 'পরিচয়' উৎপাদনে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ড যে একমাত্র দায়ী এটা বলা আমার লক্ষ্য ছিল না। গণমাধ্যম এবং তার নিয়ন্ত্রনকারী ক্ষমতাবানের কী ভূমিকা রয়েছে এক্ষেত্রে, সে সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা অন্যত্র হতে পারে। তবে এ প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য ছিল সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানে আলোচিত পরিচয় নির্মাণে ক্ষমতার যে ভূমিকা রয়েছে সেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে হাজির করা । তাই নৃবিজ্ঞানে এখন কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় কী, তার চাইতে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যে কী উপায়ে সংস্কৃতির এই পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে? আর তাই প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নৃবিজ্ঞানীর জীবন, কাজ করার পদ্ধতি, কাজের উদ্দেশ্য ইত্যাদি উদ্‌ঘাটন এবং কোন জনগোষ্ঠী যেসব ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করে তা বিশ্লেষণ নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

টীকা

১. এ 'পাশ্চাত্য' ধারণাটি মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ভৌগলিক অর্থে নয়।

২. মিউজিয়ামকে স্থির প্রতিষ্ঠান বলার কারণ এখানে সংস্কৃতির উপাদানগুলো পরিবেশনের মাধ্যমে একটা গৎবাঁধা পরিচিতি তৈরী করা হয় যা পরিবর্তনহীন। বর্তমানে মিউজিয়াম নৃবিজ্ঞান স্থির সংগ্রহশালার ভূমিকার চাইতে popular education এর মত গতিশীল ভূমিকা নিতে চাইছে।

তথ্যসূত্র

Asad, (1979) Anthropology and the Analysis of Ideology. *Man*, vol. 14.

-----(1991) Afterword: From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony. In G. W. Stocking, Jr., ed., *Colonial Situations. Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. (History of Anthropology, Vol. 7),* University of Wisconsin Press.

Beattie, J. (1964) *Other Cultures: Aims, Methods and Achivements in Social Anthropology.* Routledge.

Bolt, C. (1977) *Victorian Attitudes to Race*. RKP

Henrika Kuklick, H. (1991) *The Savage Within: The Social History Of British Anthropology, 1885-1945.* Cambridge University Press.

Lidehi, H. (1997) The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures. In *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, ed. S. Hall. Open University

Seymour-Smith, C. (1987) Macmillan Dictionary of Anthropology. London: Macmillan Press.

Tripura, P. and I. Ahmed (1994) "Tribal/Non-Tribal": Discourses on Ethnicity in Bangladesh. *Asian Studies*, No. 13.

Stocking, Jr., G. W. (1985) Essays on Museums and Material culture. In *Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture (History of anthropology, Vol. 3),* ed. G. W. Stocking, Jr., University of Wisconsin Press

Stocking, Jr., G. W. (1983) The Ethnographer's Magic: Fieldwork In British Anthropology from Tylor to Malisowski. In *Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork (History of Anthropology Vol. 1)*, ed. G. W. Stocking, Jr., University of Wisconsin Press.